তৃতীয় অধ্যায়

লোকাচারে উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালি

সাধারণভাবে 'লোক' এর দ্বারা পালিত আচার সমগ্রই হল লোকাচার। তবে লোকসংস্কৃতির দৃষ্টি থেকে লোকাচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়— লোকসমাজে যে সমস্ত আচার আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে যুক্ত এবং ঐতিহ্যগতভাবে বাহিত তাকেই লোকাচার বলে। লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লোকাচারের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কারণ মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যখন তার কর্ম প্রচেষ্টার উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে না তখন নানা বস্তুসমূহের মাধ্যমে আচার-আচরণ করে কাঙ্ক্ষিত চাহিদাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করে, ভাবে প্রকৃতি এবং দৈবশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে তার বস্তুগত ক্রিয়াকলাপ ফলপ্রসূ হবে এ বিশ্বাস থেকেই লোকায়ত সমাজে নানা ক্রিয়া এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তন। তবে ভীতি, আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ লাভ এগুলিই হল লোকাচারের মূল ভিত্তি। ড. মোমেন চৌধুরী আচারের দুটি দিকের কথা বলেছেন— 'ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান'। তাই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক আচার প্রচলিত আছে বিভিন্ন লোকসমাজে। এই আচার সমগ্রকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

১. শাস্ত্রীয় আচার

২. লৌকিক আচার

শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুযায়ী অলৌকিক শক্তি ও দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে যে আচার পালন করা হয় তাই হল শাস্ত্রীয় আচার। এর মধ্যে দিয়ে লৌকিক কামনা নয়, পারলৌকিক কামনা-বাসনাই প্রকাশ পায়।

আর লৌকিক লোকাচারগুলির মধ্যে দিয়ে মূলত পার্থিব কামনা-বাসনাই প্রকাশ পায়। এখানে পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনার কোন স্থান নেই। আর লৌকিক আচারগুলির সমস্তটাই হল প্রতীকধর্মী। এগুলির বেশিরভাগই উৎপত্তি হয়েছে আদিম সমাজে অর্থাৎ মানুষ যখন শিকার করে জীবনধারণ করত। পরবর্তীতে জীবন-জীবিকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন নতুন নানা ধরনের লোকাচার যুক্ত হয়ে পড়েছে মানুষের জীবনচক্রের সঙ্গে। পৃথিবীর অন্যান্য লোকসমাজের মতো উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালিদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের লোকাচারের প্রচলন রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সেগুলি পালন করে থাকে।

তবে বেশিরভাগ লোকাচারগুলিই জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু কৃষি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রথমে ধিমাল জনজাতির মধ্যে আচরিত জন্মকেন্দ্রিক লোকাচারগুলি আলোচনা করা হল—

উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজে জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার :

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জন্ম। আর মানব সমাজে শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত লোকাচারগুলি পালন করা হয় তাই জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার। এই জন্মকেন্দ্রিক লোকাচারগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

১. জন্মের আগে পালিত লোকাচার

২. জন্মের পরে পালিত লোকাচার

শিশুর জন্মগ্রহণের দশ মাস আগে অর্থাৎ মহিলার গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় গর্ভবতীকে ঘিরে নানা ধরনের লোকাচার প্রচলিত আছে বিভিন্ন লোকসমাজে। এ সমস্তই হল অশুভ শক্তির প্রতিরোধমূলক লোকাচার। এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন—

> ''বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত শিশু জন্মের (Child birth) অধিকাংশ আচার ও বিশ্বাস ম্যাজিক ও ট্যাবু লক্ষণাক্রান্ত। লোকাচারে ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাব বেশি, লোক বিশ্বাসে ট্যাবু বা বিধি নিষেধের প্রাধান্য।''[২]

উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজেও সন্তান জন্মের প্রাক্‌মুহূর্তে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা লোকাচার পালন করা হয়।

ধিমাল সমাজে মহিলা গর্ভবতী হলে বাঙালি সমাজের মতো 'সাধভক্ষণ'-এর বা সাধ খাওয়ানোর প্রচলন নেই। তবে ভালো সময় ও দিনক্ষণ দেখে একদিন ওঝাকে ডাকা হয়। ওঝা এসে গর্ভবতী মহিলার শারীরিক অবস্থা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নির্ণয় করে কেউ গর্ভবতীকে বাণ মেরেছে কিনা। তারপর ঘটিতে তেল ও জল নিয়ে ফুলের সাহায্যে কিংবা লোহার কাস্তের সাহায্যে বার বার ঘুরিয়ে মন্ত্রপুত করেন এবং নিয়মিত গর্ভবতীর পেটে মালিশ করতে ও খেতে বলেন যাতে মহিলা নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করতে পারে এবং সমস্ত রকম অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এটি একদিকে যেমন লোক চিকিৎসা মূলক আচার তেমনি এর সঙ্গে জড়িয়ে

রয়েছে প্রতিরোধমূলক যাদু বিশ্বাস।

এরপর ধিমালদের মধ্যে গর্ভবতীর প্রসব বেদনা উঠলে সমস্ত গর্ভবতীরাই দেবতার (থুপরিসিং দান্তাবেরাং) সামনে গিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে তার সামর্থ অনুযায়ী মোরগ, পাঁঠা, পায়রা কিংবা শুয়োর উৎসর্গ করার প্রার্থনা জানায়। এই লোকাচারের সঙ্গে তাদের নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করার উদ্দেশ্যটি জড়িয়ে রয়েছে।

ধিমালদের মধ্যে বাঁজা এবং যে নারীর সন্তান জন্মানোর পর মারা যায় তাকে নিয়েও বিভিন্ন লোকাচার পালন করা হয়। গর্ভবতী এবং বাঁজা নারীরা স্নান করে দেবতার (থুপরি সিং, দান্তাবেবাং) কাছে মানত করে কলা, সুপারি, চাল ও ডিম উৎসর্গ করে। তাছাড়া ওঝা এসে মন্ত্রপুত কলা বাঁজা নারীকে খাওয়ার জন্য প্রদান করে। শুধু তাই নয় গর্ভবতীর শরীরেও মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। আচারটির মূলে একদিকে রয়েছে আকাঙ্ক্ষা অপর দিকে রয়েছে সাদৃশ্য ও প্রতিরোধমূলক জাদু বিশ্বাস। মন্ত্রপুত ফল-মূল খেয়ে গর্ভধারণের কাহিনি শুধু ধিমালদের মধ্যে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজের লোক কথায় পাওয়া যায়। এটি সারা বিশ্বে প্রচলিত একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ।

ধিমালরা সন্তান প্রসবের জন্য বাঙালিদের মতো আলাদা আঁতুড় ঘর নির্মাণ করে না। তবে সন্তান প্রসবের জন্য আলাদা একটি ঘরকেই নির্বাচন করে নেয় কিংবা ঘরের মধ্যে একপাশে কাপড় দিয়ে আলাদা একটু জায়গা নির্দিষ্ট করে নেয়। ধিমাল সমাজে সন্তান জন্মকে কেন্দ্র করে অশুচ অর্থাৎ ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ বিচার নেই। তবে সন্তান যে ঘরে প্রসব করে সেই ঘরটিকে ওঝার দ্বারা বাণমারা (মন্ত্র দ্বারা আবদ্ধ) হয় এবং ঘরের দরজার পাশে কিংবা চালের উপর মাছ ধরার জাল ও কুল গাছের ডাল বেঁধে কিংবা ফেলে রাখা হয়। এই আচারগুলি মূলত প্রতিরোধ মূলক লোকাচার। অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার জন্য।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা বাড়িতেই সন্তান প্রসব করে। এমনকে মৃত্যুর কোলে পতিত হলেও হাসপাতালে যেতে চায় না। তাই সন্তান প্রসবে সহায়তা করে পার্শ্ববর্তী কোন মহিলা ধাই। তবে পূর্বে গর্ভবতী ধিমাল মহিলারা একা একাই সন্তান প্রসব করত এবং নিজেই সন্তানের সঙ্গে নাড়ি ছেদ করত। এ প্রসঙ্গে আমরা হজসন সাহেবের গ্রন্থে পাই—

"At births the mother herself cuts the navel string."[৩]

সন্তান প্রসবের সময় শিশুর নাড়ি কাটতে ধিমালরা ব্যবহার করে কাঁচা বাঁশের পাতলা ধারালো বাতা কিংবা নতুন মাটির কলসির ভাঙা টুকরো। নাড়ি কাটার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের নাভিতে পোড়া মাটি কিংবা কলার খোসা পুড়িয়ে লাগিয়ে দেয়। আর পুত্র সন্তান হলে তিনবার এবং কন্যা সন্তান হলে পাঁচবার উলুধ্বনি দেওয়ার আচারটি প্রচলিত আছে ধিমাল সমাজে। এই উলুধ্বনি দিয়ে অশুভ শক্তিকে যেমন দূরে রাখে তেমনি অপরদিকে পার্শ্ববর্তী সমাজকে অবগত করা হয় গর্ভবতীর কন্যা না পুত্র সন্তান হয়েছে সে বিষয়ে। সন্তান প্রসবের পর গর্ভপুষ্প পড়ে গেলে ধিমালরা সেটিকে নিয়ে ঘরের এক কোণে গর্ত করে ঢেকে রাখে। তবে মন্ত্রপুত গর্ভবতীর গর্ভপুষ্প কলার মাঝ পাতায় রেখে সেটির সঙ্গে হলুদ ও সর্ষের তেল মিশিয়ে রেখে দেয় এবং গর্ভবতীর মানত অনুযায়ী শুয়োর, পায়রা কিংবা মোরগ কেটে তার রক্ত মেখে সেটিকে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে এবং পরে তা চৌরাস্তার মোড়ে কিংবা জমিতে পুঁতে রাখে।

শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একটু গোরা (ঘরে তৈরি মদ) ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া গেরুয়া ভেলা (এক ধরনের বনজ ফল) পুড়িয়ে তার ধোঁয়া নবজাতকের নাকের সামনে ধরা হয়। যাতে কোন খারাপ বাতাস না লাগে। এগুলি প্রতিরোধমূলক জাদু বিশ্বাসজাত লোকাচার।

সন্তান প্রসবের পর শুধু শিশুকেই নয় শিশুর মাকেও নানা লোকাচার পালন করতে হয় শরীরকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার জন্য প্রসবের কিছুক্ষণ পরেই তাকে ছামের মধ্যে কিছু ধান রেখে কুটতে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রসবের পরে তাকে প্রথম খেতে দেওয়া হয় অল্প চাল ও ডাল ভাজা। তারপর আস্তে আস্তে তাকে ভাত দেওয়া হয়। চার কিংবা পাঁচ দিন পরে ধিমাল মহিলারা প্রসবের ঘর থেকে পুরোপুরি বের হয়।

ধিমালদের মধ্যে শিশু জন্মের পর বাঙালিদের মতো অন্নপ্রাসনের কোন প্রচলন নেই। তবে পাঁচ-কিংবা সাতদিন পরে নবজাতকের মাথার চুল ফেলে দেওয়ার প্রচলন আছে। ধিমলারা যাকে বলে পরিংসিকা, ভাসিংপিলি। পূর্বে এই আচারটি পালনের মূখ্য ভূমিকা নিত নবজাতকের মামা কিংবা মামার বাড়ির কোন পুরুষ অভিভাবক। মাথা নেড়া করার জন্য তাকে সম্মান বাবদ শিশুর বাবাকে অর্থ দিতে হতো সঙ্গে গোরা, পান ও সুপারি। এবং বিশ্বাস করা হত মামা শিশুর জন্মের চুল কেটে সমস্ত অপদেবতার নজর নিজের কাঁধে নিয়ে শিশুকে পাপ ও কুনজর থেকে

মুক্ত করে। কিন্তু বর্তমানে মামার স্থানে ক্ষৌরকার অর্থাৎ নাপিত এসে শিশুর মাথার চুল ফেলে দেয়। নেড়া করার সময় তাকে বসতে দেওয়া হয় শুকনো পাটের উপর। তারা মনে করে পাটের উপর বসতে দিলে শিশুর চুল পাটের মতো লম্বা ও শক্ত হবে। তাছাড়া নাপিত তার ক্ষুর ধুয়ে তার জল শিশুর মুখেও দেয়। এতে ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে শিশুর কথা ফুটবে তাড়াতাড়ি। এগুলি আসলে সংস্পর্শমূলক জাদু বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি সমাজে জন্ম কেন্দ্রিক লোকাচার :

শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও অসংখ্য লোকাচার জড়িয়ে রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের বাঙালি কারা সে সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে জাতির পরিচয় খোঁজেন আবার কেউ নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে। আমরা সেই বিতর্কে না গিয়ে আমাদের আলোচনায় বাঙালি বলতে বুঝিয়েছি উত্তরবঙ্গের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যারা বসবাস করে এবং যারা বাংলাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলে তাদেরকে। সে হিসেবে আমরা আমাদের আলোচনায় বাঙালিদেরকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছি— হিন্দু বাঙালি এবং মুসলিম বাঙালি। আর বর্তমান উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বাঙালিদের মূল শেকড় ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল। তাই আচারের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাদেশের আচারের যেমন মিল রয়েছে তেমনি আবার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আচারের সঙ্গেও উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের আচারের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বহু আচার পালন করে থাকে। এগুলির কতকগুলি শাস্ত্রীয় আবার কতকগুলি লৌকিক। আচারের দুটি ধারাই সমান্তরাল ভাবে একে অপরকে প্রভাবিত না করে নারীদের দ্বারা পালিত হয়ে চলেছে। যেমন—

পঞ্চামৃত :

সন্তান জন্মের আগে গর্ভবতীকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা যে আচারটি সর্বপ্রথম পালন করে তা হল পঞ্চামৃত। গর্ভধারণের পাঁচ মাসের সময় এই আচারটি পালন করা হয়ে থাকে। এটি পালন করা হয় মূলত বরের বাড়ি থেকেই। সেদিন গর্ভবতীকে হলুদ দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর উঠানের মাঝখানে লেপা স্থানে পিঁড়ি পেতে তার উপর গর্ভবতীকে বসানো হয়। তারপর এয়ো স্ত্রীরা যাদের সন্তান আছে এবং কোন দিন সন্তান মারা যায়নি তারা পাঁচজন

মিলে পাঁচফল ও পাঁচ রকমের মিষ্টি খাওয়ায় গর্ভবতীকে। আবার সেদিন পাঁচ পোয়া দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি পায়েসও খাওয়ানো হয় গর্ভবতীকে। এই সমস্ত আচারের মধ্যে যেমন সাদৃশ্যমূলক জাদু বিশ্বাস রয়েছে তেমনি আবার প্রতিরোধমূলক যাদু বিশ্বাসও রয়েছে।

সাধভক্ষণ বা সাধ খাওয়ানো :

এরপর জন্মকে কেন্দ্র করে যে আচারটি উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত সেটি হল 'সাধভক্ষণ' বা 'সাধ খাওয়ানো'। এই অনুষ্ঠানটি মূলত পালন করা হয়ে থাকে বরের বাড়িতে গর্ভধারণের সাতমাস কিংবা নয় মাস পরে। অনুষ্ঠানটি মূলত দু'দিন ধরে করা হয়। প্রথম দিন শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ স্বামীর বাড়ি থেকে, দ্বিতীয় দিন করা হয় গর্ভবতী মহিলার মায়ের বাড়ি থেকে। এই অনুষ্ঠানের আচারে মূলত সধবা মহিলারাই ঘনিষ্ঠভাবে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের দিন গর্ভবতীকে উপোস করতে হয় সকাল থেকে। তারপর তাকে কাঁচা হলুদ মেখে স্নান করানো হয়। এয়ো স্ত্রীরাই তাকে সাধারণত স্নান করায়। তারপর তাকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে পাঁচজন কিংবা সাতজন সধবা মহিলা ধান, দূর্বা দিয়ে আশির্বাদ করে এবং সাতবার উলুধ্বনি দেয়। তবে এই লোকাচারে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেই সম্প্রদায়গত ভাবে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেউ সাত মাসে সাধ খাওয়ানো হয় বলে সাত সংখ্যাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। যেমন সাতজন সধবা যাদের সন্তান আছে এবং কোন দিন সন্তান মারা যায়নি তাদের দিয়ে সমগ্র আচারের উপাদান তৈরি করান। সাত রকমের ফল সেদিন গর্ভবতীর আঁচলে বেঁধে দেন। সাধের দিনে গর্ভবতীকে পাথরের থালার উপর দাঁড় করিয়ে দুধ ও কলা খাওয়ানো হয়। সেটিকে এমনভাবে খাওয়ানো হয় যাতে কিছু অংশ মুখ থেকে নীচের থালায় পড়ে। তাছাড়া গর্ভবতীর ইচ্ছে অনুযায়ী সাত রকমের সুস্বাদু খাবারও তৈরি করার প্রচলন আছে। আর এই দিন যে পায়েস গর্ভবতীকে খাওয়ানো হয় সেটা তৈরি করানো হয় সধবা স্ত্রীকে দিয়ে যার প্রথম সন্তান ছেলে এবং যার কোন সন্তান নষ্ট হয়নি বা মারা যায়নি। এই সুস্বাদু খাবার খাওয়ানোর পেছনে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে প্রতিরোধ মূলক যাদু বিশ্বাস রয়েছে। যার ফলে সন্তানের আর লালা ঝড়বে না বা খাবারের জন্য লোভী হবে না। অপর দিকে পুত্রবতী সধবাকে দিয়ে পায়েস রান্না করানোর মধ্যে রয়েছে সংস্পর্শমূলক যাদু বিশ্বাস অর্থাৎ তার রান্না করা পায়েস খেলে ভাবীসন্তানও পুত্র হবে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ মানসিকতায় পুত্রের গুরুত্ব যে অধিক তা আচারের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। গর্ভবতী মহিলাকে পায়েস খাওয়ানোর মধ্যেও বিশেষ লোকাচার রয়েছে। সেদিন

পাঁচ-সাত জন ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পাশে বসিয়ে গর্ভবতীকে পায়েস খাওয়ানো হয়। এখানে গর্ভবতীর কোল যাতে ভরে ওঠে তারই অনুকরণ করা হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চাদের বসিয়ে পায়েস খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে। এটি সংস্পর্শ ও অনুকরণ মূলক যাদু বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়াও গর্ভবতীর অজান্তে ঘরে একটি পাথর ও একটি মাটির প্রদীপকে কুলো বা ডালি দিয়ে ঢেকে রেখে গর্ভবতীকে দিয়ে বেরা করানো হয়। এই পাথর লম্বাকৃতি হল পুরুষাঙ্গের প্রতীক আর মাটির প্রদীপ হল স্ত্রী অঙ্গের প্রতীক। গর্ভবতী যেটি হাত দিয়ে তুলবে সেটি তার ভাবী সন্তান হবে বলে বিশ্বাস। তারপর পাথর কিংবা প্রদীপ সধবা স্ত্রীরা কোলে নেয় তারপর সেটির উপর জল ঢেলে দেয়। জল ঢেলে দেওয়ার মধ্যেও সাদৃশ্যমূলক যাদু বিশ্বাস জড়িয়ে আছে। জল ঢালার অর্থ নবাগত সন্তান আসার পর একই ধরনের আচার করবে অর্থাৎ প্রস্রাব করে দেবে। কোল ভেজাবে।

আঁতুড় ঘর তৈরি :

বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটলেও গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মহিলারা এই সেবা অনেক সময়ই পায় না। তাই আজও দেখা যায় গ্রামীণ গর্ভবতীরা বাড়িতেই সন্তান প্রসব করে। সন্তান প্রসবের আগে তাদের জন্য আলাদা আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। এবং পার্শ্ববর্তী কোন মহিলাই এই সন্তান প্রসবের সময় সাহায্য করে থাকে। প্রসবের সময় সন্তানের নাড়ি কাটা হয় বাঁশের ধারালো বাতা দিয়ে এবং নাড়ি কাটার পরে সন্তানের নাভিতে উনুনের পোড়া মাটি লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া আঁতুড় ঘরের উপর নিড়ানি, কাস্তে, লোহা, ঝাড়ু, কুলোর ডাল, মাছ ধরার জালও রেখে দেয়। এই আঁতুড় ঘরটি তৈরি করে উঠানের মাঝখানে ছন (কাশ জাতীয় লম্বা ঘাস) বা পাটশলা দিয়ে টং এর মতো করে। আঁতুড় ঘরের উপর ঝাড়ু কিংবা লোহার তৈরি কোন বস্তু রাখার পেছনেও প্রতিরোধমূলক যাদু বিশ্বাস রয়েছে। বাঙালিরা মনে করে এগুলি শিশু ও তার মাকে সমস্ত রকম অপদেবতা ও কুনজর থেকে রক্ষা করবে। উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে পুত্রসন্তান হলে পাঁচবার আর কন্যা সন্তান হলে তিনবার উলুধ্বনি দেয়। এই উলুধ্বনির গুরুত্ব বা তাৎপর্য কি তা পূর্বে ধিমালদের জন্মকেন্দ্রিক লোকাচারে তুলে ধরেছি। তাই এখানে আবার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

ষষ্ঠী :

শিশুর জন্মের পর ছয়দিনের দিন পালিত লোকাচার ষষ্ঠী নামে পরিচিত। ঐ দিন শিশুর মাকে নানা আচার পালন করতে হয়। সেইদিন সকালে প্রথমে শিশুকে হলুদ গোলা জল দিয়ে

স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে সুসজ্জিত করে পূর্বদিকে মাথা রেখে শোয়ানো হয় এবং মাথার দিকে খাতা কলম বই রেখে দেয়। এদিন উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে ষষ্ঠীর দিন যমরাজ শিশুর ভাগ্য লিখে যান। শিশুর মাও সেদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উপবাস করে দিনের শেষে ছয় রকমের তরকারি দিয়ে ভাত খায়। তাছাড়া শিশুর মা সেদিন সারা রাত জেগে থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে আঁতুড় ঘরে। প্রদীপ কোনমতেই নিভতে দেয় না। এই সমস্ত আচারগুলির মধ্যে অনুকরণ মূলক অর্থাৎ সমক্রিয়ামূলক যাদু বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। প্রদীপ আসলে এখানে জীবনেরই প্রতীক। তাই সন্তানের মা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে সন্তানের দীর্ঘ জীবন কামনা করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি মুসলিম সমাজেও ষষ্ঠীর আচার পালিত হয়, তবে তা অনেকটাই হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে কিছু পার্থক্যও রয়েছে ষষ্ঠীর রাতের আগের রাতেই অর্থাৎ পাঁচদিনের রাতেই শিশুর মা সারাদিন উপোস থেকে শিশুকে কোলে নিয়ে রাতে নানা ধরনের তরকারি দিয়ে ভাত খায়। এতে সাদৃশ্যমূলক যাদু বিশ্বাস রয়েছে। তারা মনে করে মা নানা তরকারী দিয়ে খেলে শিশু বড় হলে সেগুলি দিয়ে খেতে পারবে। আর শিশুর মাথার দিকে রাতে কুলায় ধান, বই, খাতা ও কলম রেখে দেয়। ঐ রাতে ঘর থেকে বের হয় না। আবার শিশুকে কোলে নিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে মাটিতে ভক্তি করে সন্তানের জন্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনসম্পদ কামনা করে। মুসলিম বাঙালিরাও বিশ্বাস করে যে আল্লা এই দিনে শিশুর ভাগ্য তৈরি করে দেয়।

নত্তা :

শিশুর জন্মের নবম দিনে নাপিত ডেকে শিশু ও তার মাকে কামিয়ে শুদ্ধ করে ঘরে তোলার লোকাচারই হল নত্তা। উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে নত্তা নামক লোকাচার সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিনে করা হয়। ছয়, নয়, এগার, তের, একুশ এমনকী একত্রিশ দিনেও করা হয়ে থাকে।

নামকরণ :

হিন্দু শাস্ত্র মতে দশম সংস্কারের অন্যতম সংস্কার নামকরণ হলেও উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা শিশুর নামকরণে শাস্ত্রীয় সংস্কারের পাশাপাশি লৌকিক সংস্কারকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই শিশুর জন্মের ছয় দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিনে শিশুর মা-বাবা, ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার পছন্দ করা নামগুলি চিহ্নিত করে আলাদা আলাদা মাটির প্রদীপ জ্বালায়। আর যে প্রদীপটি উজ্জ্বল হয়ে

দীর্ঘক্ষণ জ্বলে সেই নির্দিষ্ট চিহ্নিত নামটি শিশুকে দেওয়া হয়। এতে শিশুর খ্যাতি ও সম্মান প্রদীপের শিখার মতোই উজ্জ্বল হবে বলে বাঙালির যাদু বিশ্বাস রয়েছে।

অন্নপ্রাশন/মুখে ভাত :

নির্দিষ্ট বয়সে শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে শক্ত খাবার (বিশেষ করে ভাত পায়েস) খাওয়ানোর লোকাচারই হল অন্নপ্রাশন। এটি হিন্দুদের দশম সংস্কারের অন্তর্গত হলেও এর আমোদপ্রিয়তা মূলত লোক ঐতিহ্যের ধারাকেই বহন করে। সাধারণত পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ছয়মাসে কিংবা আটমাসে এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সাত কিংবা নয় মাসে এই লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে। এই দিন শিশুকে স্নান করানোর জন্য উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা সাধারণত বাদ্য বাজিয়ে নদী কিংবা পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে আসে এবং সেই জলের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে শিশুকে স্নান করায়। তারপর সমস্ত শরীরে তেল মাখিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে কাজল, চন্দন দিয়ে সুসজ্জিত করে এবং মায়ের বাড়ির থেকে আগত মামা কিংবা দাদুর কোলে বসিয়ে তাদের হাতেই পায়েস খাওয়ানো হয়। তারপর শিশুর সামনে ঘট, প্রদীপে পাশাপাশি একটি বড় থালায় নানা দ্রব্য বিশেষ করে বই, কলম, খাতা, টাকা, সোনার তৈরি কোন জিনিস, পাটের দড়ি, মাটি প্রভৃতি রেখে শিশুর ভবিষ্যৎ জানার মধ্যে নানা লোকাচার পালন করা হয়। শিশু সেচ্ছায় সামনে রাখা থালার যে দ্রব্যটিতে প্রথম হাত রাখবে সেটির প্রতিই সে ভবিষ্যতে মনোযোগী হবে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ খাতা, কলম, বই তুললে লেখা পড়ায় ভালো হবে, মাটি তুললে কৃষক হবে, টাকা তুললে প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। এ সমস্তই হল সমক্রিয়া বা সাদৃশ্যমূলক জাদু বিশ্বাস।

মামার বাড়ির শাক ভাত খাওয়া ঙ্ম

অন্নপ্রাশনের আড়াই দিন পরে মামার বাড়িতেও শিশুকে নিয়ে গিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে মামার কোলে বসিয়ে নতুন থালা গ্লাসে পঞ্চব্যঞ্জনে শাক ভাত খাওয়ানো হয়। এরপর থেকেই শিশু যে কোন স্থানে খাবার গ্রহণ করার স্বীকৃতি পায়। আসলে মামার বাড়িতেই ভাগ্নে প্রথম ভাত খায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই এই আচারটির উদ্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি।

উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালি সমাজে বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার :

মানুষের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিবাহ অন্যতম। বিবাহের মধ্যে দিয়ে সমাজ নারী ও পুরুষের যৌনতাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে যৌনতাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নারী পুরুষের বংশ রক্ষা, নিরাপত্তা এমনকী পারলৌকিক কামনা-বাসনাও এর মধ্যে নিহিত আছে। মানুষের জীবনে বিবাহের যেমন একাধিক গুরুত্ব রয়েছে তেমনি আবার এই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক লোকাচার। কোন কোন জাতি জনজাতির বিবাহের মধ্যে শুধুমাত্র লৌকিক আচার স্থান পেয়েছে। আবার কোন কোন জাতি জনজাতির বিবাহে শাস্ত্রীয় আচার এবং লৌকিক আচারের সংমিশ্রণ ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের বাঙালি সম্প্রদায়ের বিবাহের আচারগুলির মধ্যে শাস্ত্রীয় আচার এবং লৌকিক আচারের মিশ্রণ ঘটেছে। আবার ধিমালদের আচারগুলি পুরোপুরি লৌকিক। তবে আমাদের লোকসংস্কৃতির আলোচ্য বিষয় মূলত লৌকিক আচারকে নিয়ে। বিবাহের আচারগুলির উদ্ভবের পেছনে দুটি কারণের কথা বলেছেন ড. ওয়াকিল আহমেদ—

১. সংস্কারবোধ

২. আমোদ প্রিয়তা

বিবাহ সমস্ত লোকসমাজের কাছেই একটি শুভ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচ্য। তাই পাছে কোন অমঙ্গল হয় বা অপদেবতার দৃষ্টি পরে তা কেউই চায় না। সকলের আশীর্বাদ নিয়েই সুখী দাম্পত্য জীবনের সূচনা হোক তাই সবাই কামনা করে। সুতরাং দেখা যায় এই কল্যাণ কামনা এবং বিপদমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই মূলত বিবাহের লোকাচারগুলির উদ্ভব হয়েছে।

তাছাড়া বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে লোকসমাজ কিছুটা আমোদ-প্রমোদ করার সুযোগও খুঁজে নিয়েছে। যার ফলে বিবাহে বেশ কিছু লোকাচার যুক্ত হয়ে পড়েছে।

বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে বিবাহের লোকাচারে মূলত দুটি দিক রয়েছে, একটি হল তার সামাজিক স্বীকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর অপরটি যাদু এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। যাদু বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত লৌকিক আচারগুলিকে আবার প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. পবিত্রকরণ

২. প্রতিষেধনকারী

৩. উর্বরতাসূচক

বর-কনেকে সব ধরনের অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দাম্পত্য জীবনে শুভকারী দৈবশক্তির প্রভাব বিস্তার করার পেছনে রয়েছে পবিত্রকরণ যাদুবিশ্বাস। অপদেবতা বা অশুভ শক্তির হাত থেকে বিবাহিত জীবনকে মুক্ত রাখতে যে ব্যবস্থা করা হয় তার পেছনে রয়েছে প্রতিষেধনকারী যাদু বিশ্বাস। আর বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে সন্তান উৎপাদন তাই এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উর্বরতাসূচক লোকাচার। উর্বরতাসূচক লোকাচারগুলোকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১. কৌমার্যভঙ্গের প্রতীক সূচক

২. দাম্পত্য মিলনের ইঙ্গিতব্যঞ্জক

৩. সন্তান সম্ভাবনার ব্যঞ্জনাবহ

৪. নিরাপদে সন্তানলাভের প্রত্যাশাদ্যোতক

বিবাহের সমগ্র লোকাচারকে আবার সময়ের দিক থেকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে—

১. বিবাহ পূর্বকালীন লোকাচার

২. বিবাহকালীন লোকাচার

৩. বিবাহ উত্তর লোকাচার

বিবাহের মূল অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য বিবাহের অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি পর্বকে ঘিরে যে সমস্ত আচার পালিত হয় সেগুলি হল বিবাহ পূর্বকালীন লোকাচার। আর বিবাহের মূল অনুষ্ঠান চলাকালীন যে আচার পালিত হয় তা বিবাহকালীন লোকাচার। বিবাহের মূল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও পরে কিছু আচার পালন করতে হয় যেগুলিকে বিবাহ উত্তর আচার বলা হয়।

প্রথম ধিমাল সমাজের বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচারগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হল—

ধিমাল সমাজে বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার :

উত্তরবঙ্গের ধিমালরাও তাদের বিবাহকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের লোকাচার পালন করে থাকে। ধিমালদের বিবাহের ক্ষেত্রে মা-বাবার থেকে ছেলে-মেয়ের ভূমিকাই সর্বাধিক। কারণ ছেলে-মেয়ের পছন্দ হলে মা-বাবা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আবার মেয়ের পছন্দ না হলে

মা-বাবা কখনোই বিবাহে জোর করে না। এদিক থেকে ধিমাল সমাজে নারীর মূল্য অন্যান্য জাতি জনজাতির থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেকটা এগিয়ে। আবার ধিমালদের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স কখনোই বাঁধা হয়ে দাড়ায় না। পূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেত মেয়ের বয়স ছেলের বয়সের থেকে তিন-চার বছরের বেশি। এতে ধিমালরা যুক্তি দেখাত সংসারের বৃহৎ দায়িত্ব মেয়েকেই সামলাতে হয়— তাই তাকে বুদ্ধিমতী হতে হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা যায় বিবাহে বয়সের পার্থক্য অর্থাৎ কম বেশি যে কারো হোক না কেন- তা তাদের কোন সমস্যা তৈরি করে না। তবে বর্তমান উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজ ছেলে ও মেয়ে কাউকেই অন্য সমাজে বিবাহ করার সামাজিক স্বীকৃতি দেয় না। তবে এখানে এটাও বলা আবশ্যক যে, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা কঠোরভাবে কার্যকরী হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে তা অনেকটাই শিথিল। তার কারণ ধিমাল সমাজে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা অনেক কম। তাই বাধ্য হয়ে ছেলেরা অন্য সমাজ থেকে (বাঙালি, রাজবংশী, নেপালি, লিম্বু, মেচ) মেয়ে নির্বাচন করে নিয়ে আসে। বিয়ের পর মেয়েটি ধিমাল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর ছেলেকে নিজ সমাজে বিবাহের স্বীকৃতি পেতে দণ্ড স্বরূপ প্রদান করতে হয় কিছু টাকা, গোরা (ঘরে তৈরি মদ বিশেষ) ও পান সুপারি। ধিমালদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্বে বিবাহ পূর্বকালীন ছেলে ও মেয়ে অবাধে মেলামেশা করতে পারত। মেয়ের যৌন স্বাধীনতা ছিল। পুরুষরাও বহু বিবাহ করত। একজন ধিমাল পুরুষ তিনজন স্ত্রী রাখতে পারত। তবে বরপণ অধিক হওয়ায় অবস্থাবান ধিমালরা ছাড়া কেউই একের বেশি বিয়ে করতে পারত না। এ প্রসঙ্গে H.H.Risley বলেছেন—

> Polygamy is permitted up to a supposed maximum limit of three wives, but the tribe is a poor one, and very few Dhimals can afford themselves the luxury of more than one wife.[৪]

বর্তমানে ধিমালদের বিবাহের লোকাচারগুলিতে পার্শ্ববর্তী সমাজের প্রভাবে কিছু পরিবর্তন হলেও পুরোপুরি পাল্টে যায়নি। ধিমালদের নানা পদ্ধতির সঙ্গে এগুলি পালিত হয়। ধিমালদের বিবাহের নানা পদ্ধতিগুলি হল—

১. বরদাঙ্গী বিহাউ (ছেলে মেয়ে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ)

২. সালাউ রূহুকা বিহাউ (সামাজিক বিবাহ)

৩. গুয়াই বিহাউ (সুপারি বিবাহ)

৪. টানিতেং কাইন্যা চুমাকা রীত বিহাউ (কনেকে জোর করে টেনে এনে বিবাহ)

৫. ডুহুয়া তাকা রীত বিহাউ (বিধবা বিবাহ রীতি)

৬. ঘানজিয়া জিং তেং চুমার রীত বিহাউ (কনের বাড়িতে বর এনে বিবাহ)

৭. জারী বিহাউ (অন্যের স্ত্রীকে এনে বিবাহ)

১. বরদাঙ্গী বিহাউ (ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ) :

বর্তমান উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজে বরদাঙ্গী বিবাহই সর্বাধিক প্রচলিত। এই বিবাহ পদ্ধতিতে ছেলে ও মেয়ে কোন অনুষ্ঠানে কিংবা কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে কাউকে পছন্দ করে থাকে। তারপর ছেলে কিংবা মেয়ে যে কোন একপাশ থেকে মধ্যস্থকারী হিসেবে ঘটকীর সাহায্য নেওয়া হয়। যাকে ধিমাল ভাষায় কারহুয়ানী বলে। সে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তারপর একদিন ছেলে তার বন্ধুদের সঙ্গে করে ঘটকীর সাহায্যে অভিভাবকের অজান্তে মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। তবে কন্যাকে আনার আগে ছেলের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই কন্যা নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের বাড়ির সকলে পাড়া প্রতিবেশীরা স্বাগত জানায়—

'সোনাকো ওয়াজান, সোনাকো বেজান লোখেরে' অর্থাৎ সোনার ছেলে ও সোনার মেয়ে আসছে বলে। এরপর ছেলের বোন কিংবা ভাই তাদের দু'জনের পা ধুইয়ে দেয়। তারপর ছেলে ও মেয়ে উভয়কে বসতে দেওয়া হয় ধোকরায় (পাট দিয়ে তৈরি হাতে বোনা মাদুর বিশেষ)। তারপর ছেলের মা বরণ ডালা সাজিয়ে নববধূকে বরণ করে নেয়। বরণ ডালায় থাকে ধান, দূর্বা, ঘট এবং ঘটের উপর পাঁচটি আমপাতা, তাছাড়া প্রদীপ হলুদ প্রভৃতি। বাড়ির বয়স্করাও ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। এরপর পাঁচবলি নামে একটি আচার প্রচলিত আছে। এই আচারে ধানী গৃহদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গ্রাম ঠাকুরের থানে পাঁচটি মোরগ, পাঁচটি কলা, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি ও পাঁচ বোতল ইউ (ঘরে তৈরি মদ) দিয়ে পূজা দেয়। গ্রাম দেবতাকে পুজো দেওয়ার পেছনে রয়েছে অপদেবতা বা অশুভ শক্তির হাত থেকে নবদম্পতিকে মুক্ত রাখা। আর পূজার উপকরণগুলি লক্ষ করলেও দেখা যায় এর বেশির ভাগগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে উর্বরা শক্তির প্রতীক রূপে। এই পাঁচবলির আচার পালন না হওয়া পর্যন্ত নববধূ ও বরকে একত্র থাকতে দেওয়া হয় না।

আর অপরদিকে ঘটকীর কাছে খবর পেয়ে মেয়ের বাবা ও অভিভাবকেরা (বিশেষ করে বাবা, মামা, কাকা, জামাইবাবু, দাদা) মেয়ের খোঁজে ছেলের বাড়িতে আসে যাকে ধিমাল ভাষায় বলা চামদি ভলি বা কইন্যা ভলি। মেয়ের বাড়ির অভিভাবকেরা ছেলের বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য হল মেয়েটি স্বেচ্ছায় এসেছে না তাকে জোর করে আনা হয়েছে- সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। মেয়েকে জোর করে আনা হলে অভিভাকেরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং দণ্ড স্বরূপ ছেলেকে টাকা ও গরু দিতে হয় মেয়ের অভিভাবকদের। আর মেয়ে স্বেচ্ছায় এসেছে জানালে অর্থাৎ বিবাহে সম্মতি জানালে মেয়ের বাড়ি থেকে আগত অভিভাবকদের পা কাঁসার থালার উপর রেখে বর নিজে ধুইয়ে দেয় এবং গামছা দিয়ে মুছিয়ে তেল মালিশ করে দেয়। এরপর তাদেরকে ইউ খাওয়ানো হয় লোটায় (ঘটিতে) করে। এর উপরে ও নীচে কলার পাতা দেওয়া হয়। কন্যার বাড়ি থেকে আসা সবাইকে ছেলে ও মেয়ে প্রণাম করে। তারপর এই পাঁচবলি আচারের দিনই ছেলের বাড়ির বয়স্ক বৃদ্ধ বা অভিভাবকেরা ছেলে মেয়েকে সামনে বসিয়ে মেয়ের অভিভাবকদের সামনে দশটি রীতি বুঝিয়ে দেন। এই দশটি রীতি হল—

১. চোর-কসুর (চুরির দোষ স্বীকার) - এই রীতি অনুযায়ী ছেলে মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের সামনে মেয়েকে পান-সুপারি মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের হাতে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

২. পাঞ্চৌলি (পাঁচজন) - পাঞ্চৌলি কথাটি এসেছে পঞ্চ থেকে। ধিমালরা পাঞ্চলী বলতে গ্রামের বিশিষ্ট পাঁচজন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। এখানে ধিমাল সমাজের বিশিষ্ট পাঁচজন লোককে পাঁচ বোতল ইউ এবং কিছু টাকা ও পান সুপারি দেওয়া হয়।

৩. ধামী (ওঝা) - ধিমাল সমাজে বিবাহে ধানী বা ওঝা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কারণ ওঝাই ছেলে ও মেয়েকে বড় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত রোগ ব্যাধি ও অপদেবতার কাছ থেকে রক্ষা করে এসেছে। তাই তাকে দেওয়া হয় দু বোতল ইউ (ঘরে তৈরি মদ)।

৪. মণ্ডল (ধিমালদের মধ্যে প্রধান) - ধিমালদের মধ্যে একজন সবসময় দেওয়ানি থাকে। যার হাতেই থাকে শাসন যন্ত্র। যাকে তারা জাতিয়া প্রধান বা গ্রা বলে। তাকে খুশি করার জন্য দু বোতল ইউ দেওয়া হয়।

৫. দুধোলী (মাতৃঋণ শোধ) - এটি ছেলেকে দিতে হয় মেয়ের মায়ের জন্য অর্থাৎ

শাশুড়িকে। কারণ মেয়ের মা দীর্ঘদিন লালন পালন করে মেয়েকে বড় করেছে। আর হঠাৎ করে ছেলে গিয়ে একদিন তুলে নিয়ে আসে মায়ের কোল খালি করে। তাই ছেলে তার ঋণ বাবদ শাশুড়িকে দেয় একটি শাড়ি, সাতটি পান, দু থেকে সাত টাকা এবং এক বোতল ইউ।

৬. সেনকেলাওনী - বাবা-মায়ের কাছে থাকাকালীন কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে তা মাপ করে দেওয়ার জন্য গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকেও পান সুপারি ও ইউ দেওয়া হয়।

৭. ধনাস কাউরী - এই রীতিতে নব-বিবাহিত বর ও বধূ ছোটদের হাতে সাত টাকা ও সাতটি সুপারি প্রদান করে।

৮. ঘরমৈনী - এই রীতিতে নববধূ গ্রামবাসীদের অনুরোধে উপস্থিত সবাইকে ইউ বিতরণ করে। এর উদ্দেশ্য সে যেন নতুন পরিবেশ দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে।

৯. চুমান - এই রীতিতে বরের পিতা-মাতা কন্যা পক্ষকে দুটি পান ও দুটি সুপারি প্রদান করে।

১০. ঘর ছেকাউনি - বিবাহ অনুষ্ঠানটি যাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় এই নিয়মে তাদেরকে কিছু ইউ ও পানা সুপারি প্রদান করতে হয়।

ধিমাল জনজাতির মধ্যে উপযুক্ত লোকাচারগুলি পালন না করলে তাদের দাম্পত্য জীবনকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এমনকী এই স্বীকৃতির আগে কোন নারী কিংবা পুরুষ বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলেও তাকে সৎকারের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সামাজিকভাবে।

ধিমালদের বিবাহে দশটি রীতি বোঝানোর পর বর-বধূ সামাজিক স্বীকৃতি পায় ঠিকই কিন্তু এখানেই বিবাহের আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হয় না, এর কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ছয় থেকে আট দিনের মধ্যেই ছেলের বাড়ির আর্থিক অবস্থা যাচাই করার জন্য মেয়ের বাবার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যাকে ধিমালরা বলে বাংসা ঘাকা। এই বাংসা ঘাকা আবার দু ধরনের বারকা বাংসা ঘাকা ও মিহিকা বাংসা ঘাকা। মেয়ের বাবা তার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে যাদের খাওয়ানোর সমস্ত দায়িত্ব থাকে নতুন জামাই এর। তাই জামাই প্রথমবার শ্বশুর বাড়িতে আসার সময় ভাড়ে করে দই, চিঁড়া, মিস্টি, তোলে, গেন্দ্রক ইত্যাদি (ধিমালদের তৈরি নিজস্ব পিঠে বিশেষ) নিয়ে আসে। এটি আসলে বিয়ের পর বধূকে সঙ্গে নিয়ে জামাই এর প্রথম বার শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জামাইকে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পরিচিতি করানোর উদ্দেশ্যও জড়িত রয়েছে। তবে ছেলের আর্থিক অবস্থা খারাপ

থাকলে বারকাঘাকা অনুষ্ঠানটি পাঁচ-ছয় মাস পরে করার জন্য সময় চেয়ে নেওয়া হয় কন্যা পক্ষের কাছ থেকে। তবে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া বন্ধ থাকে না নব বর-বধূর। তারা সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয় শ্বশুর বাড়িতে। শ্বশুর বাইরের কাউকেই নিমন্ত্রণ করে না। ঘরোয়া ভাবে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান করে যাকে ধিমালরা বলে মিহিকা বাংসা ঘাকা বা ফিনুঘাকা। এই আচারের মধ্যে দিয়েই বরদাঙ্গী বিবাহ সমাপ্ত হয়।

২. সালাউ রূহুকা বিহাউ (সামাজিক বিবাহ) :

এই বিবাহ বর ও কন্যা উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। মধ্যস্থকারী হিসেবে সাহায্য নেওয়া হয় ঘটকের। তবে ধিমাল সমাজে পাত্র পক্ষ থেকেই প্রথম পাত্রী নির্বাচন করা প্রস্তাব পাঠানো হয়। পাত্রীর পাশ থেকে ঘটক নিয়োগ করলে পাত্রীর কোন দোষ আছে বলে ধিমালরা মনে করে থাকে। প্রথমে পাত্রপক্ষের অভিভাবকেরা (মা-বাবা, কাকা- জ্যেঠা, মামা) পাত্রী নির্বাচন করতে যায়। সঙ্গে নেয় নারকেল, পান-সুপারি, ইউ গেরে বসে তার বানানোর ফুল অর্থাৎ কন্যা নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। প্রথম বারে রাজি না হলেও তিন চারবার একই ভাবে অনুরোধ করলে পাত্রীর বাবা রাজি হয়ে যান। পাত্রের বাবার এই আচারকে বলা হয় গোরায় জল ঢালা। তারপর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয় তবে তা শাস্ত্র মতে শুভক্ষণ বা শুভ দিন দেখে নয়, দু পক্ষের কাজের সুবিধা অনুযায়ী যে কোন দিন। বিয়ের নির্দিষ্ট দিন পাত্রের বাড়িতে সকালে ধামী এসে গ্রাম পূজা করে গ্রাম দেবতার উদ্দেশ্যে। তারপর জল পড়ে (মন্ত্রপুত করে) পাত্রের গায়ে ছিটিয়ে দেয় এবং অবশিষ্ট জল ঘটিতে রেখে মূল ঘরের পশ্চিম দিকের কোণায় ঝুলিয়ে রাখে। এখানে জল ছিটিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিষেধনকারী যাদু বিশ্বাসই প্রকাশ পেয়েছে। এরপর বর নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করে বরযাত্রী সহ বিবাহ করতে বের হয়। সঙ্গে থাকে নানা বাদ্যযন্ত্র (ঢাক আবশ্যিক)। বরযাত্রীদের সঙ্গে দেওয়া হয় হুকা, বিড়ি, ইউ প্রভৃতি সামগ্রী। আর পাত্রকে নিয়ে যেতে হয় মেয়ের জন্য দাকা-বোনা (ধিমালদের ব্যবহৃত শাড়ি বিশেষ যা বুক থেকে হাটু পর্যন্ত ঢাকা থাকে)। বিয়েতে ঢাক বাজানো, আতসবাজি পোড়ানো কিংবা উলুধ্বনি দেওয়ার মধ্যে আমোদ প্রমোদ যেমন জড়িয়ে আছে তেমনি অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার এক যাদু বিশ্বাসও নিহিত আছে। ধিমালদের বিবাহে বর ও বরযাত্রীদের যখন পাত্রীর বাড়ির সামনে পৌঁছায় তখন তাদের প্রবেশ পথ আটকানো হয় কয়েকটি ধাপে এবং পাত্রকে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয় রঙ্গ তামাশার মাধ্যমে এবং পাত্রের কাছ থেকে

আদায় করা হয় টাকা, গরু এবং পান সুপারি। তাছাড়া পাত্রী পক্ষের ছেলে-মেয়ে বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নাচ গান পরিবেশন করে থাকে।

তারপর পাত্রীর মা পাত্রকে বরণ করে নেয় বরণডালা দিয়ে যেখানে থাকে পান, সুপারি, হলুদ, ধান, দূর্বা, জলপূর্ণ ঘট এবং ঘটের উপর থাকে পাঁচটি আমপাতা এবং ঘটের গায়ে দেওয়া হয় পাঁচটি সিন্দুর ফোটা। এগুলির প্রত্যেকটি একেকটির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র সংখ্যা ঙ্ম ১০)। বরকে বরণ করার পর তাকে ধোকরার উপর বসিয়ে কিংবা চেয়ারে বসিয়ে মেয়েকে সাতপাক ঘোরানো তারপর পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে মালা পরিয়ে দেয় এবং পাত্র মেয়ের সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দেয় তিনবার। তারপর পাত্র তার শাশুড়িকে একটি দাকা, বোনা ও লাউয়ের বশে আনা ইউ প্রদান করে। একই সঙ্গে পাত্রের বাড়ি এবং পাত্রীর বাড়ির লোকজনেরা মিলে হুঁকা খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। তারপর পাত্রী পক্ষের অভিভাবকদের সামনে পাত্র ও পাত্রীকে বসিয়ে দশটি রীতি (পূর্বে আলোচিত) বোঝানো হয়। এই দশ রীতির মাধ্যমে বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি পায়। এরপর পাত্র এবং পাত্রীর মা-বাবা পরস্পর পরস্পরকে ইউ পরিবেশন করে এবং গ্রামের বিশিষ্ট পাঁচজন ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে নব বিবাহিত বর-বধূকে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। বর ও কন্যা দুজনেই উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে। বিদায় পর্বেও ধিমালরা সমস্ত বরযাত্রীদের ইউ পরিবেশন করে। আর নববিবাহিত বধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বর শ্বশুরের কাছে মাথা নত করে বলেন— 'আপনার আশীর্বাদ থেকে আমরা কোনদিন বঞ্চিত না হই।'

নববধূকে ছেলের বাড়িতে আনার পর পাত্রের মাও নববধূকে বরণ ডালা ছুইয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে বধূকে বরণ করে নেয়। সেদিন সকালে ধামী এসে গ্রাম থানে আতপ চাল ও কলা দিয়ে পূজা দেয় এবং সেই কলা নববধূকে খাওয়ানো হয়। নববধূর মাথায় জল ছেটানো ও কলা খাওয়ানোর মধ্যেও প্রতীকি তাৎপর্য রয়েছে। নববধূ শ্বশুর বাড়ি আসার পরের দিন পাত্রে বাড়ির আত্মীয়রা নব বিবাহিত বর-বধূকে নিয়ে মাছ ধরতে যায় নদীতে। তারপর সেই ও শুয়োরের নাড়ির সঙ্গে রান্না করে নববধূ সকলকে খাওয়ায়। এইদিনই আবার চুন-কালি খেলা বলে একটি আচার পালিত হয় ধিমালদের বিবাহের পর। এইদিন কড়াই এর কালি চুন ও সর্ষের তেল ও বনজ এক ধরনের গাছের রস এক সঙ্গে মিশিয়ে বর ও বধূকে লাগিয়ে পরে অন্যান্যদেরও লাগানো হয়। এই রং খেলার মধ্যে দিয়েই আনুষ্ঠানিক বিবাহের সমাপ্তি ঘটে।

৩. গুয়াই বিহাউ (সুপারি বিবাহ) :

এই বিবাহের নিয়ম অনুসারে কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে তবে সেই ছেলেটি মেয়েটির হাতে সুপারি তুলে দেয় তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। মেয়েটি যদি সেই ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে ছেলেটির দেওয়া সুপারি গ্রহণ করে। আর পছন্দ না হলে সুপারি গ্রহণ করে না। মেয়েটির সম্মতি থাকলে পরবর্তীতে দু'জনে পরামর্শ করে ঘটকী নিয়োগ করে থাকে। তারপর বরদাঙ্গী বা সামাজিক মতে আচার পালন করে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৪. টানিতেং কাইন্যা চুমাকা রীত বিহাউ (জোর পূর্বক বিবাহ) :

এই নিয়ম অনুসারে কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে তবে সে মেয়ের কাছে তার পছন্দের কথা জানায়। কিন্তু মেয়ে যদি রাজি না হয় তবে ছেলে রেগে গিয়ে তার বন্ধুদের সহযোগিতায় মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে জাদুটোনা করে বশীকরণের চেষ্টা করে, চেষ্টা সফল হলে বরদাঙ্গী রীতিতে বিবাহ দেওয়া হয়। তবে এই বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার খর্ব হয় বলে বর্তমান ধিমালরা মনে করে। তাই বর্তমানে এই বিবাহ রীতি লুপ্ত হওয়ার পথে।

৫. ডাঙ্গুয়া তাকা রীত বিহাউ (বিধবা বিবাহ রীতি) :

পূর্বে ধিমাল সমাজে এই প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল না। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে ধিমালদের মধ্যে বিধবা বিবাহ অনুপ্রবেশ করে। ফলে অল্প বয়স্ক কোন মহিলার স্বামী যদি মারা যায় তবে সে ডাঙ্গুয়াতাকা রীতির মাধ্যমে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। ডাঙ্গুয়াতাকা রীতি হল কোন বিধবা মহিলা নিজে কিংবা কোন ঘটকীর সাহায্যে যদি কোন ছেলে কিংবা পুরুষকে বিবাহের জন্য রাজি করায় তবে তাকে সেই পুরুষকে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ডেকে এনে 'পঞ্চ'র (গ্রামের পাঁচজন বিশিষ্ট লোক) সামনে তাকে বসিয়ে পা ধুইয়ে দিতে হয় এবং এই বিবাহে পাঁচজনের সামনে উচ্চারণ করে— 'নানি সাংইয়াংকা ডাঙ্গুয়া তাহিঘা' অর্থাৎ আজ থেকে আমি এসে ডাঙ্গুয়া রাখলাম। এরপর উপস্থিত পঞ্চ সহ সকলকে বিধবা নিজেই ইউ পরিবেশন করে থাকে। এই রীতিতে পুরুষকে তার নিজের পিতৃকূলের দেব-দেবীসহ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়। তাই পুরুষটিকে বলা হয় কুল ডুব্বা। বিবাহিত পুরুষটিকে আজীবন বিধবার বাড়িতে থাকতে হয়।

৬. ঘানজিয়া জিং তেং চুমাং রীত বিহাউ (কনের বাড়িতে বর এনে বিবাহ) :

যে সমস্ত ধিমাল পরিবারে ছেলে নেই শুধুমাত্র মেয়ে আছে সেই সমস্ত পরিবারে এই রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে মেয়ের সম্মতি নিয়ে অভিভাবকরাই ঘটকী (কারহুয়ানী) নিয়োগ করে। ছেলে রাজি থাকলে মেয়ের বাড়ির লোকজন গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে। নববধূকে যেভাবে ছেলের মা বরণ করে নেয় এক্ষেত্রে মেয়ের মা ছেলেকে বরণ করে নেয় মাথায় পান দিয়ে। এরপর সমস্ত গ্রামবাসীদের ইউ খাওয়ানো হয় মেয়ের বাড়ি থেকে। বিয়ের পর ছেলেটি মেয়ের কুলের পরিচয়ে পরিচিত হয়। এই বিবাহে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

৭. জারী বিহাউ (অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে এনে বিবাহ) :

কোন বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে কোন বিবাহিত পুরুষ কিংবা অবিবাহিত ছেলের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে স্ত্রীর ইচ্ছায় পঞ্চ'র উপস্থিতিতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই রীতিতে পূর্বের স্বামীকে জরিমানা স্বরূপ তার বিবাহের সমস্ত খরচ দিয়ে দেওয়া হয়। এবং পূর্বের স্বামী স্বীকৃতি জানালে তবেই পরবর্তীতে দশরীতি পালন করে আবার সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি সমাজের পালিত বিবাহের লোকাচার :

উত্তরবঙ্গের বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠান এক বিরাট ও দীর্ঘ সময় ধরে চলা প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের লোকাচার। তবে এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, একই অঞ্চলের স্থান ভেদে এমনকি সম্প্রদায়গত ভাবেও অনেক সময় লোকাচারের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের বিবাহের লোকাচারগুলি নিচে আলোচনা করা হল—

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন :

বিবাহের আনুষ্ঠানিক সূচনা পাত্রপাত্রী নির্বাচন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আর এই ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যস্থকারী হিসেবে ঘটকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আগে পাত্রের বাড়ি থেকে পাত্রী নির্বাচন করতে যায়। আর এই ক্ষেত্রে পাত্র স্বয়ং তার বন্ধুদের নিয়ে কখনো বা বয়স্ক লোকেরা পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে থাকেন। সেইদিন পাত্রীকে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে কিছু মিষ্টি দ্রব্য এবং পান সুপারি সঙ্গে নিয়ে পাত্রে কিংবা বয়স্কজনদের সামনে উপস্থিত হতে হয়। আর

এই ক্ষেত্রে পাত্রীকে সাহায্য করে থাকে তার বৌদি কিংবা অন্যান্য বিবাহিত মহিলারা। পাত্রীকে দেখে পছন্দ হোক আর নাই হোক দক্ষিণা বা সম্মান হিসেবে মেয়ের হাতে কিছু টাকা দিতেহয়। আর এই টাকার পরিমাণও সব সময় বিজোড় সংখ্যা হয়ে থাকে। বিবাহে বিজোড় সংখ্যাকে শুভ মনে করা হয়। আবার পাত্রীর পক্ষ থেকেও একই ভাবে পাত্র নির্বাচন করতে গেলে পাত্রের হাতেও কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

আশীর্বাদ বা পাকা দেখা :

পাত্র পাত্রী পরস্পরকে পছন্দ করলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা হয়। আর এই সম্বন্ধকে পাকা রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাত্রের বাড়ি থেকে বয়স্ক লোকেরা পাত্রীর বাড়িতে যে মাঙ্গলিক আচার পালন করে তাই আশীর্বাদ বা পাকা দেখা নামে পরিচিত। তবে এটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন নামে (আশীর্বাদ, মঙ্গলাচরণ ও লগ্নপত্র) পরিচিত।

পানখিলির তাৎপর্য ও উদ্ভব সম্পর্কে কামিনি কুমার রায় বলেছেন,—

> ‘‘পাকা দেখার পরও অনেক সম্বন্ধ ভেঙে যায়; হয়তো তার জন্যেই পাকা দেখা ও বিবাহের মধবর্তী সময়ে সে সম্বন্ধকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেই পানখিলি প্রক্রিয়ার উদ্ভব।’’[৫]

অধিবাস :

পানখিলির পরে এবং বিবাহের আগের দিন রাতে অধিবাস পালন করা হয়। পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের বাড়িতেই এই আচারটি পালিত হয়। আর এই পর্বে জড়িয়ে রয়েছে বিয়ের একাধিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার। এই জন্য দুটি বরণ ডালার একটিতে ধান, দূর্বা, কলা, পান, সুপারি, সিঁদুর, পাঁচটি মাটির প্রদীপ সুতো, তিলক ও অপরটিতে আতপ চাল, মাসকালাই ও হলুদ বাটা রাখা হয়। পুরোহিত এসে পাত্রের বাড়িতে পাত্রকে ও পাত্রীর বাড়িতে পাত্রীকে চন্দনের তিলক পড়িয়ে দেন। এবং হলুদ লাগানো সূতো পাত্রের ডান হাতে এবং পাত্রীর বাম হাতে বেঁধে দেন। তবে অনেক সময় অধিবাসে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বাড়ি ও প্রতিবেশির এয়োরাই বরণ ডালায় থাকা বিভিন্ন দ্রব্য পাত্র এবং পাত্রীর কপালে ও মুখে ছুঁইয়ে কিংবা লাগিয়ে দেন। এবং দুইজনের হাতেই দর্পণ দেওয়া হয়। পাত্রীর হাতে কাজল লতা আর পাত্রের হাতে লোহার জাতা আর কলার মাঝ। এগুলি প্রতিরোধমূলক যাদু বিশ্বাস থেকে জাত।

গায়ে হলুদ :

গায়ে হলুদ বিবাহের একটি অপরিহার্য লোকাচার। পাত্র এবং পাত্রী উভয় বাড়িতেই এই লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিবাহের তিন দিন আগে থেকেই গায়ে হলুদ দেওয়া হয় আর হিন্দুদের বিবাহে সাধারণত অধিবাসের পরেই গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। এই সময় পাত্রীকে একটি নতুন লালপেড়ে শাড়ি পড়ানো হয়। যাকে বলে হলুদ মাখা শাড়ি। আশীর্বাদের দিন পুরোহিত পাত্রীকে আলপনা দেওয়া উঁচু পিঁড়ির উপর বসিয়ে প্রথমে মাথায় ধান দূর্বা এবং চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তারপর বরপক্ষের বয়স্করা কোন অলংকার এবং টাকা দিয়ে পাত্রীকে আশীর্বাদ করে থাকেন। আর এয়ো স্ত্রী লোকেরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেয়। শাঁখা, সিঁদুর, বস্ত্র, অলংকার, পান-সুপারি, দই-মিষ্টি, মাছ প্রভৃতি আশীর্বাদের আবশ্যিক উপকরণ। আশীর্বাদের সময় পাত্রীর সামনে একটি জলপূর্ণ ঘট ও তাতে পাঁচটি আমপাতা বাঁধা থাকে। তাছাড়া প্রদীপ ও ধান দূর্বা আশীর্বাদের অপরিহার্য উপাদান। আশীর্বাদের সময় বয়স্করা পাত্রীকে এমনভাবে দই চিনি খাওয়ান যাতে হাত উপচে তার কিছুটা নিচে থাকা থালায় পড়ে অর্থাৎ দেখা যায় বিবাহের সূচনা থেকেই বিভিন্ন প্রতীকি উপাদান (পান, সুপারি, চিনি, দই) ব্যবহৃত হয়েছে। হলুদ রং বিবাহে মঙ্গল চিহ্ন বহন করে। তাই কনের মা হলুদ জল গুলে বরপক্ষের থেকে আসা সকলের কাপড়ে লাগিয়ে দেন।

পান খিলি :

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে আশীর্বাদের পরে এবং বিবাহের পূর্বে পানখিলি নামক একটি লৌকিক আচার পালন করা হয়ে থাকে। এটি পুরোপুরি স্ত্রী আচার। এখানে পাত্রের মা কিংবা পাত্রীর মা পার্শ্ববর্তী কয়েকজন সধবা স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। তারা পানখিলির দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এসে উপস্থিত হন। তারপর উঠানে কিংবা ঘরে সুন্দর গোলাকার করে আলপনা দিয়ে তার উপর মঙ্গল ঘট বসান। প্রদীপ জ্বেলে পাশাপাশি দুখানা পেতলের থালা বাটিতে তেল-সিঁদুর, পান-সুপারি, মিষ্টি, বাতাসা সাজিয়ে গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে কিংবা তুলসী তলায় পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। তারপর পানে সিঁদুর লাগিয়ে ভেতরে সুপারি দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ভাঁজ করে বাঁশের শলা বা কাঠি দিয়ে গাঁথা হয়। শেষে সধবারা তেল ও সিঁদুর একে অপরের মাথায় ও সিঁথিতে ছুঁইয়ে গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। যেখানে পান হলুদের জন্ম

কথা বর্ণিত হয়েছে। হলুদ মাখার সময় সধবা স্ত্রীরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগে গীত পরিবেশন করত। তবে এই গীত পরিবেশন উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজে বর্তমানে প্রচলিত থাকলেও হিন্দু সমাজে তা লুপ্ত প্রায়। গায়ে হলুদের পর্বটি অনেক সময় আবার ছেলের বাড়িতে সম্পন্ন হওয়ার পরেই মেয়ের বাড়িতে হয়। কখনো কখনো আবার পাত্রের লাগানো অবশিষ্ট হলুদ পাত্রীর বাড়িতে পাঠানো হয় তাই দিয়ে পাত্রীর গায়ে হলুদ হয়। গায়ে হলুদের এই আচারটির মধ্যে মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় যেমন জড়িয়ে থাকে তেমনি আবার পবিত্রীকরণের ব্যাপারটিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

জলভরা :

জলভরা উত্তরবঙ্গের বাঙালি সম্প্রদায়ের বিবাহে পালিত একটি বিশেষ লোকাচার। এই আচার পাত্র এবং পাত্রী উভয় বাড়িতেই পালিত হয়। পাত্র/পাত্রীর মা অথবা মাতৃস্থানীয় যে কেউ কয়েকজন এয়ো স্ত্রীকে সঙ্গে করে কলসী কাঁখে বাদ্যের তালে নাচতে নাচতে পার্শ্ববর্তী নদী বা পুকুরে যান জল ভরতে। তবে সরাসরি কলসী ডুবিয়ে জল না ভরে এখানে কিছু আচার পালন করে থাকে। অধিবাসের বরণ ডালায় করে আনা পাঁচটি পান, দুটি সুপারি, কলা, তেল, সিঁদুর ও মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রথমে ঘাটে পুজো দেয় তারপর একটি কাস্তে বা লোহার ছুঁরি দিয়ে জল সামনে থেকে যোগ গুণ চিহ্নের মতো কেটে কলসী ডুবিয়ে জল ভরে আনেন এবং পাঁচটি প্রশাখা আমপাতা কলসীর মুখে দিয়ে বাড়ির উঠোনের মাঝে আলপনা দেওয়া স্থানে রেখে দেন। এই জল দিয়ে পাত্র ও পাত্রীকে স্নান করানো হয়। এটিকে বরস্নানের প্রাথমিক পর্ব বলা চলে।

সোহাগ মাগা :

এটি কনের বাড়ি বিবাহের দিন দুপুরে কিংবা সকালে পালিত স্ত্রী আচার। কনের মা অন্যান্য কয়েকজন সধবাকে নিয়ে প্রতিবেশিদের বাড়িতে যান সোহাগ আনতে। সঙ্গে উপকরণ হিসেবে থাকে একটি কুলো এবং তার মধ্যে চাল, চিনি, কাঁচা হলুদ, পান, সুপারি, ঘি, দই, বাতাসা প্রভৃতি। সোহাগ লাগাকালীন কন্যার মা কোন কথা বলতে পারেন না। সঙ্গে যারা থাকেন বাড়িতে ঢোকা মাত্রই তারা উলুধ্বনির মাধ্যমে বাড়ির কর্ত্রীকে ডাকেন। পূর্বে সোহাগ লাগার সময় গীত গাওয়ার প্রচলন ছিল। তা আর নেই। যে বাড়িতে সোহাগ আনতে যান সেই বাড়ির দরজায় কুলোটাকে মাটির উপর রাখা হয়। তারপর কুলোর সামনের দিকে মাটির মধ্যে গুণ চিহ্ন আঁকা হয়। এবং

অঙ্কিত স্থান থেকে অল্প মাটি কুলোতে তোলা হয়। আর গৃহকর্ত্রী তখন কুলোতে যা থাকে তাই ঘর থেকে একটু একটু করে সেই পাত্রে দেন। সোহাগ লাগার উদ্দেশ্য হল মেয়ের মঙ্গলের জন্য আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে আশীর্বাদ চাওয়া।

বরযাত্রা :

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহের আর একটি বিশেষ লোকাচার হল বরযাত্রা। এখানে বর কন্যার বাড়িতে যায় বিবাহ করার জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে। মাথায় থাকে মুকুট, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা, হাতে মঙ্গলসূত্র ও জাতি। বর বাড়ি থেকে বিবাহের জন্য যাত্রা করার পূর্বে কিছু বিশেষ আচার পালন করে থাকে। যেমন মা তাকে কোলে বসিয়ে দুধ খেতে দেন গ্লাসে করে। আবার পুত্রকে বলে যেতে হয় যে মায়ের জন্য সে দাসী আনতে যাচ্ছে।

বরবরণ :

বর বরযাত্রী সহকারে পাত্রীর বাড়িতেু বয়ে করার জন্য উপস্থিত হলে পাত্রকে গৃহের প্রবেশ পথে আটকানো হয়। আর কিছু লোকাচার এখানে পালিত হয়। যেমন বরকে বসিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয়। এরপর তাকে কিছু মিষ্টি খাইয়ে কন্যার মা বরণ করে নিয়ে যায়। তাছাড়া এখানে কন্যা পক্ষের লোকেরা বর পক্ষকে আটকে কিছু অর্থও আদায় করে থাকে। আর বর তা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পায়। তবে অনেক বিয়েতে আবার ছাদনা তলাতেই বরবরণের আচারটি পালিত হয়ে থাকে। এখানে পাত্রী পক্ষ থেকে বরকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। এবং এছাড়া শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি দিয়ে থাকে স্বাগত জানায়।

কন্যা সম্প্রদান, মালাবদল ও শুভদৃষ্টি :

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিবাহে বরকে গৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে এসে পা ধূইয়ে দিয়ে বসানো হয় যেটি বিবাহ মণ্ডপ নামেও পরিচিতি। এখানে দুটি পিঁড়ি রাখা থাকে একটিতে বসে পাত্র আর অপরটিতে পাত্রী। পাত্রীকে পাত্রের বাম দিকে বসানো হয়। তারপর এখানে গিঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। এখানে নাপিতের বিশেষ ভূমিকা আছে তবে কন্যা সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় আচার অনুযায়ী হয়েই থাকে। এখানে চারটি কলাগাছ চারকোনায় পোঁতা থাকে। আর মাঝে থাকে আল্পনা। এখানে পাত্রকে বসানোর পর পাত্রীকে অপর একটি পিঁড়িতে বসিয়ে দাদা কিংবা জামাইবাবু পাত্রের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে মুখামুখি বসিয়ে দেন। তারপর একটি কাপড় মাথার উপর দিয়ে ঢেকে একটি দেন। পাত্র ও পাত্রীর দৃষ্টি বিনিময় করতে হয়।

সিঁদুর দান :

কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের প্রথম দিন অধিবাসের সময় শাখা সিঁদুর পরানো হয়। আবার কেউ কেউ বাসি বিয়ের দিন। বর তা বিবাহ মণ্ডপে বা ছাদনা তলায় বা হাতের আঙুল দিয়ে কনের সিঁথিতে তিনবার দেয়। বর যখন সিঁদুর দান করে তখন বরও কনের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়।

বাসি বিবাহ ও বরবিদায় :

উত্তরবঙ্গে সাধারণত বিবাহের পর দিন বাসিবিবাহ সম্পন্ন হয়। আর এই বাসিবিবাহ শেষ হওয়ার পরই বর বধূকে বিদায় দেওয়া হয়। তবে কনেকে বরের বাড়ি যাত্রা কালে কিছু আচার পালন করে থাকে। কনেকে বিবাহ মণ্ডপের মাঝে একটি আল্পনাযুক্ত পিঁড়িতে বসিয়ে তার আঁচলে কিছু ধান অনেকে খই, মুড়ি দেন যা কনে মাথার উপর দিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বধূবরণ :

কনের বাড়িতে যেমন বরবরণ করা হয় ঠিক তেমনি বরের বাড়িতে বধূবরণ করা হয়। এই সময় মেয়েরা শঙ্খ ধ্বনি, উলুধ্বনি দেয়। তারপর গৃহের মাঝে একটি পিঁড়িতে বসিয়ে তাকে বরণ করা হয়। বরণ করা হয় ধান, দূর্বা দিয়ে। এরপর বধূর মুখে শাশুড়ি মিষ্টি তুলে দেয়। তবে এই আচারের বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের কেউ নববিবাহিত নববধূকে বরণ করার পর তাকে ধরতে দেন। আবার অনেকে আলতা গোলা জল একটি থালায় রেখে দেন যার উপর পা ডুবিয়ে বধূ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যা শুভদৃষ্টি নামে পরিচিতি। এরপর পরপর তিনবার মালাবরণ করায়। মালা বরণের পর ছাদনা তলায় দুটি পিঁড়ি বসানো হয় বরও পাত্রীকে। তার পর গিঁটচড়া বেঁধে দেওয়া হয়। এখানে নাপিতের ভূমিকা আছে। সে পাত্র পাত্রীকে গায়ে জল ছিটিয়ে ছড়া বলে। যা গেটর বদন নামে পরিচিত। এরপর কন্যাসম্প্রদায় এই পর্বের অন্য একটি শাস্ত্রীয় আচারের সঙ্গে যুক্ত।

বউভাত :

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিবাহে বউভাতের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। এটি সাধারণত বিয়ের পরের দিন অর্থাৎ তিন দিনের দিন করা হয়ে থাকে। এইদিন স্ত্রী বরের বাড়িতে রান্না ঘরে ঢোকার অনুমতি পায়। তাছাড়া স্পর্শ সম্পৃক্ত খাবার পরিবেশন করা হয়। আবার বধূ নিজেই পরিবেশন করে থাকে অনেক সময়।

অষ্টমঙ্গলা :

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি সূচিত হয় অষ্টমঙ্গলার মধ্যে দিয়ে। বিবাহের অষ্টম দিনে কনের বাড়িতে এই অষ্টমঙ্গলা অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই দিন বর ও কনের গাঁঠছড়া ও মঙ্গলসূত্র খোলা হয়। এইদিন বরকে বিশেষ বাড়িতে মাছ, দই ও মিষ্টি খাওয়াতে হয়। এমনকি প্রতিবেশীরাও আসেন বধূকে দেখার জন্য। এখান থেকে আড়াই দিনের দিন আবার বর বধূকে নিয়ে ফিরে আসে।

ধিমাল সমাজে মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার :

মৃত্যু জীবনের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুকে এড়ানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। মৃত্যুর রহস্য মানুষকে আদিকাল থেকেই ভাবিয়ে তুলেছে। আদিম মানুষেরা যখন দলবদ্ধভাবে বসবাস করত তখন দলের কারো মৃত্যু হলে তারা ভেবে নিত প্রকৃতি বা দেবতা তার প্রতি রুষ্ট হয়েছে তাই সে মৃত্যুর কোলে পতিত হয়েছে। তাছাড়া আদিম মানুষ বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই আত্মার ভালো এবং মন্দ- দুইই করার ক্ষমতা আছে। তাই তারা একদিকে ভয় ও অপরদিকে মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনায় নানা ধরনের সংস্কার এবং আচার পালন করতে লাগলেন। সময়ের পরিবর্তন হলেও সেই ধারা আজও অব্যাহত। তাই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের জনসমাজই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক লোকাচার পালন করে থাকে কখনো ভয় থেকে মুক্তি পেতে আবার কখনো মৃতের আত্মার শান্তি কামনায়। উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ধিমাল সমাজেও বিভিন্ন গোত্র উপগোত্রগুলির মধ্যে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একাধিক লোকসংস্কার ও লোকাচার পালিত হয়ে থাকে। ধিমাল সমাজে মোট চৌদ্দটি গোত্র রয়েছে। যথা—

১. দোংগে	২. দিঙ
৩. তালিপা	৪. হরদিয়া
৫. নুনিয়া	৬. হরদিয়া নুনিয়া
৭. রাথুম	৮. থারু
৯. কাশের	১০. লাতের
১১. অংলাইতি	১২. লেমবাঙ
১৩. তেগরে (অগ্নিয়া)	১৪. যোগী

এই উপর্যুক্ত গোত্রগুলির অধিকাংশের উৎপত্তিই হয়েছে মৃতদেহকে সৎকারের পদ্ধতির বা আচারের ভিন্নতা থেকে। কারণ প্রত্যেক গোত্রই তাদের স্বতন্ত্র লোকাচারের মাধ্যমে মৃতদেহ সৎকার করে থাকে। ধিমাল সমাজে বিভিন্ন গোত্রগুলির মধ্যে শবদাহ বা সমাধিস্থ করার পদ্ধতি যেমন ভিন্ন তেমনি ধিমাল সমাজে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা ও কমবয়স্ক ছেলে মেয়েদের শব সমাধিস্থ করার পদ্ধতিও ভিন্ন।

ধিমাল সমাজে কারো মৃত্যু হলে প্রথমেই ডাকা হয় গ্রামের লাণ্ঢা বা সিপাইকে। এই লাণ্ঢা হল ধিমাল সমাজ ব্যবস্থার সংবাদ সংগ্রাহক ও সংবাদদাতা। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করে লাণ্ঢ আছে। এই লাণ্ঢা নির্বাচন করা হয় পঞ্চকের (সমাজের পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তি) মাধ্যমে। সে সমস্ত গ্রামবাসীদের মৃত্যুর খবর দিয়ে ডেকে আনে। আবার মৃতের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের কাছেও সে সংবাদ পাঠায়।

ধিমালরা মৃত্যুর পর মৃতদেহকে ঘরে রাখে না। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বের করে উঠানের কিংবা বারান্দায় উত্তর দিকে মাথা করে শুইয়ে রাখে। এরপর মৃতদেহের উপর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় পা থেকে বুক পর্যন্ত। আর মাথার পাশেই তাদের আচার অনুযায়ী অর্ধসেদ্ধ ডিম ভাজা তিন জায়গায় ভাগ করে দেয় এবং সঙ্গে থাকে জলের ঘটি আর কপালে রাখা হয় কাঁচা টাকা। এই উপকরণগুলি রাখার তাৎপর্য সহজেই অনুমান করা যায় যে ধিমালরা জন্মান্তরবাদে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরেও আত্মার যাতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে না হয় এমনকী পাথেয় খরচ হিসেবেও কিছু কাঁচা টাকা তার কপালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। (চিত্র সংখ্যা ঞ্ব ১১ ক)

লাণ্ঢার কাছে মৃত্যুর খবর পেয়ে লোকজন দ্রুত ছুটে আসে। তারপর তারা মিলিত ভাবে কাঁচা বাঁশ কেটে বাঁশের মাঞ্চুলী (বাঁশের দোলা) তৈরি করে। এটি দেখতে অনেকটা মই এর মতো হয় কিন্তু মই এর থেকে একটি চওড়া। এটি তৈরি করা হয় আট-দশ ফুট লম্বা দুটি বাঁশ দুপাশে রেখে আর ছোট ছোট বাঁশের টুকরো মাঝে মাঝে পাট কিংবা সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে। তাছাড়া মৃত দেহকে বাড়ি থেকে মরাঘাটিতে (শ্মশান/সমাধিস্থান) নিয়ে যাওয়ার আগেও বাড়িতে ধিমালরা নানা সংস্কার ও আচার পালন করে থাকে। যতক্ষণ মৃতদেহ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ মৃতের শরীরে কেউ না কেউ স্পর্শ করে থাকে। তাছাড়া মৃতের শরীরের বিভিন্ন অংশে চোখে নাকে নাভিতে ও গোপনাঙ্গের কাছে তারা দূর্বা ও তুলসী পাতা দিয়ে থাকে। এর পেছনে

বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন তুলসী পাতার জীবানুনাশক গুণ যে রয়েছে সেদিক থেকে তুলসীপাতা দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। মৃতের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে কালো সুতো এবং তার বুকের উপর একটি ছোট পাথর রেখে দেয়। তারপর মৃতদেহকে স্নান করিয়ে তেল মেখে দেন। তবে ধিমালদের সব গোত্রই একই আচার পালন করে না। হরদিয়া গোত্রের ধিমালরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগে মৃতের শরীর স্নান করিয়ে হলুদ মেঘে দেন। তারপর বাড়ি থেকে মৃতদেহকে মরাঘাটিতে (শ্মশান/ সমাধিস্থল) নিয়ে যান মাঞ্চালীতে (বাঁশের দোলা) করে। তাদের মাঞ্চালী আবার সবাই বহন করতে পারে না। মৃতের ছেলে ভাই জামাই ও নিকট আত্মীয়রাই একমাত্র মাঞ্চালী বহন করে। যতজন প্রয়োজন হয় ততজনই কাঁধ লাগাতে পারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। আর সঙ্গে থাকে গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা। তবে শ্মশানযাত্রী হিসেবে কোন মহিলা মরাঘাটিতে যেতে পারে না। মৃতদেহকে মরাঘাটিতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও কিছু আচার পালন করে থাকে ধিমালরা। নুনিয়া গোত্রের লোকেরা নুন, হরদিয়া গোত্রের লোকেরা হলুদ ও দোংগে গোত্রের লোকেরা শিমূল গাছের ছোট ছোট ডাল কিংবা বাকল রাস্তায় ছিটিয়ে ছিটিয়ে মৃতদেহ মরাঘাটিতে নিয়ে যায়। আবার সমস্ত ধিমালরাই মৃত ব্যক্তির ব্যবহার করা পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী তার ব্যবহার করা সমস্ত কিছুই মরাঘাটিতে এনে জ্বালিয়ে দেন। কারণ ধিমালরা বিশ্বাস করে পোশাক পরিচ্ছদ ও তার ব্যবহার করা জিনিসপত্র বাড়িতে থাকলে মৃতের আত্মা এগুলির জন্য বাড়িতে ঘোরাফেরা করবে। বাড়ির কোন লোককে ভয় দেখাবে। মরাঘাটিতে নিয়ে আসার পর মৃতের মাপ অনুযায়ী ছয়-সাত ফুট লম্বা ও তিন-চার ফুট চওড়া গভীর চারকোনা গর্ত খোড়া হয়। পরে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগে গর্তের চতুর্দিকে তিন পাক ঘোরানো হয়। এবং গর্তের ভেতরে সাদা কাপড় বিছিয়ে উত্তর দিকে মাথা রেখে বিবস্ত্র অবস্থায় শোয়ানো হয়। মৃতের উপরেও একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় (চিত্র সংখ্যা ঞ্ম ১১ খ)। তারপর মৃতের বড় ছেলে তিন মুঠো মাটি শরীরের উপর দেওয়ার পরে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও শ্মশানযাত্রীরা মাটি দেন। আর সমাধির উপরে এখানেও বাড়ির মতো করে অর্ধসেদ্ধ ডিম ভাজা তিনভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে বাটিতে থাকে জল। আর সমাধিস্ত করার আগে কপালে দেওয়া হয় কাঁচা টাকা। আর সমাধি সম্পন্ন হলে সমাধির উপর পাথর চাপা দেয়। আবার একটি মুরগির বাচ্চা এবং পাশে একটি কলা গাছ লাগিয়ে দেয়। (চিত্র সংখ্যা ঞ্ম ১১ গ,ঘ)আর মৃতের শরীরের উপর থেকে সমাধির উপর পর্যন্ত একটি সাদা সুতো বের করে রাখা থাকে যেটির মাধ্যমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন মৃতের আত্মাকে বাড়িতে নিয়ে

আসা হয় বলে বিশ্বাস করে ধিমালরা। তবে মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি সবক্ষেত্রে একই রকমের নয়। পুরুষ এবং মহিলা, কুমার এবং কুমারী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন কোন মহিলা যদি গর্ভকালীন সাতমাসের অবস্থায় মারা যায় তবে ওই মহিলার পেট চিড়ে গর্ভস্ত সন্তানকে বের করে মা ও সন্তানকে আলাদা আলাদাভাবে সমাধিস্ত করা হয়। আবার গর্ভকালীন প্রাথমিক অবস্থায় থাকলে তার পা বেঁধে তাকে সমাধিস্ত করা হয়। যাতে সে কোন অশুভ শক্তির জন্ম দিতে না পারে। বিবাহ পূর্বকালীন কোন ছেলে যদি মারা যায় তবে তার সমাধির উপরে একটি কুলগাছ লাগানো হয়। ধিমালরা বিশ্বাস করে যে ওই কুলগাছটি তার সঙ্গী অর্থাৎ বউ। কুলগাছকে স্ত্রী রূপে কল্পনা- এখানে টোটেম ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে ধিমাল সমাজে কোন কুমারী মেয়ে মারা গেলে তার সমাধির উপরে কলাগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয় তার স্বামী হিসেবে। এখানে কলাগাছ পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত। তবে আবার কখনো কলাগাছ ধিমাল সমাজে তার উর্বরা শক্তির জন্য নারী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় ধিমাল সমাজে মঙ্গলবার অথবা শনিবার কোন বিবাহিত মহিলা অথবা পুরুষ মারা গেলে তার সঙ্গী হিসেবে সমাধির উপরে কলাগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে ধিমালদের অন্য বিশ্বাস যেমন আছে। তেমনি আবার একই কলাগাছ পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জীবনসঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

তবে অগ্নিয়া গোত্রের ধিমালরা মৃতদেহ সমাধিস্ত করে না। তারা মরাঘাটিতে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনক্ষণের মধ্যেও ধিমালদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে H.H. Risley তাঁর 'The tribes and castes of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন—

> "Some prefer the third day, some the sventh day and others again thirteen day".[৬]

তবে বর্তমানে তিন, সাত, দশ, তের দিন এমনকি একমাস পরেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। মৃতদেহ সৎকার শেষে শ্মশানযাত্রীরা সবাই স্নান করে বাড়িতে চলে আসে। আসার পরেও তাদের কিছু আচার পালন করতে হয় বাড়িতে। মৃতের বাড়িতে উঠানে কলার পাতায় রাখা হয় তেতো, শুকনো পাট পাতা বা শুকৌতি, লোহার কাস্তে বা নিড়ানি এবং তুলসীপাতা দেওয়া জল এবং আগুন। শ্মশানযাত্রীরা সবাই এসে প্রথমে হাত-পা আগুনে সেঁকে বা আগুন স্পর্শ করে। একটি শুকৌতি মুখে দেয়। তুলসীপাতা যুক্ত জল শরীরে ছিটিয়ে নেয় এবং লোহা স্পর্শ করে ঘরে

প্রবেশ করে (চিত্র সংখ্যা ঙ্ম ১১ ঙ)। তবে মৃতের বাড়ির লোকেরা এই আচার পালন করে না। এগুলি সমস্তই হল প্রতিরোধমূলক জাদু বিশ্বাস। অর্থাৎ আগুন লোহা স্পর্শ করলে কোন অশুভ শক্তি বা আত্মা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ধিমালদের মধ্যে পিতার মৃত্যুতে ছেলে ধামীর (পুরোহিত) দেওয়া সাদা মার্কিন থান কাপড় ও একটি সাদা কাপড়ের মালা পরিধান করে তের দিনের জন্য। ওই তের দিনই বাড়ির সবাই মাছ, মাংস, মদ স্পর্শ করে না। ঘরের বাইরে উঠানে কলাগাছের টুকরো দিয়ে উনুন তৈরি করে আতপ চাল সেদ্ধ করে খায়। তেল, নুন, হলুদ পর্যন্ত এই কয়দিন ব্যবহার করতে পারে না। চুল, নখ কাটতে পারে না এমনকি তেল, সাবানও লাগাতে পারে না শরীরে। আবার মায়ের মৃত্যুতে ছেলে ও মেয়ে একবছর পর্যন্ত দুধ খায় না। আবার বাবার মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত কলা খায় না এমনকি তাদের অতিপ্রিয় ইউ (ঘরে তৈরি মদ) পর্যন্ত পান করে না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শ্রাদ্ধের দিন ভোরে ধামী (পুরোহিত) কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে মরাঘাটি থেকে পূর্বে বের করে রাখা সাদা সুতোর সঙ্গে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া সুতো জুড়ে দিয়ে কাসার বাটি একটি বড় বস্তা সেলাই করা সূঁচ দিয়ে বাজাতে বাজাতে মৃতের আত্মাকে আহ্বান করে। সমাধিস্থানে পালিত এই আচারটি জিউ কাইকা (জীবকে ডাকা) নামে পরিচিত। সাদা সুতো যদি রাস্তায় কোথাও ছিঁড়ে যায় অবশিষ্ট সুতোও সেখানে রেখে দেওয়া হয়। এরপর পেছন দিকে না তাকিয়ে নদীতে গিয়ে স্নান করে নেয়। এবং নদীর ঘাটে মৃতের বড় ছেলে বালির ঢিবি তৈরি করে তিন জায়গায় জমের নামে চাল কলা উৎসর্গ করে। এবং নদী থেকে মাছ ধরে একটি মাছ নদীর ঘাটে আগুন জ্বালিয়ে মাটির পাত্রে গরম তেলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর মৃতের বড় ছেলে যে মালা পরিধান করে থাকে তাকে নদীর মাঝে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর তেলে ভাজা মাছ ঘট সহ রেখে বাঁশের লাঠি দিয়ে ভাঙা হয়। তারপর মালা ধারণকারী ব্যক্তি জলে ডুব দিয়ে সেই মালা পরিত্যাগ করে। এরপর ক্ষৌরকার্যের আচারটি পালিত হয়। পূর্বে ধিমালরা নিজেরাই একে অপরের মাথা নেড়া করে দিত তবে বর্তমানে তার আর প্রচলন নেই। তাই অন্য সম্প্রদায় থেকে নাপিত এসে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে। মাথা নেড়া করার পর বাড়ির বড় ছেলে উঠানে এসে দাঁড়ায় এবং তার যেকোন বোন এসে পা ধুয়ে তেল লাগিয়ে দেয়।

শ্রাদ্ধের দিন ধিমালদের বাড়িতে কলাগাছের প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। এবং আমন্ত্রিত গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজন সবাই এসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ধিমালদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

ভোজ নামে পরিচিত। এই দিন কয়েক হাঁড়ি ইউ উঠানের মাঝে রেখে দেওয়া হয় এবং ছোট বড় সবাই পরস্পরকে প্রণাম করে ইউ পান করে। এই ইউ পরিবেশনেরও একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে- গ্লাসের নিচে ও ইউয়ের গ্রাসটিকে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে সবার সামনে বিধবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। আবার তাকে দুবোতল ইউ জড়িমানা দিতে হয়।

আবার এই দিন বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় গ্রামের ধামী (পুরোহিত) ও পঞ্চের (পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তি) উপস্থিতিতে একটি সভার আয়োজন করা হয় উঠানের মাঝখানে। এই সভায় মৃতের আত্মাকে স্বর্গে পাঠানো হয়। আর সভা চলাকালীন কোন লোকই পুরুষ কিংবা মহিলা সভা ছেড়ে যেতে পারে না। আর এই সময় বিধবা মহিলারা সভায় বসা লোকের মধ্যে ভাত মাংস (শুয়োর, মুরগী), ডাল, শাক-সব্জী পরিবেশন করে। তবে সে পরিবেশনে একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। কোন পুরুষ যদি মারা যায় তবে প্রত্যেক প্রকার শাকসব্জী, মাংস সাতবার পরিবেশন করা হয় আর কোন মহিলা মারা গেলে পাঁচবার। আর বসে বসে ইউ (গোরা ঘরে তৈরি মদ) পান করার সময় চিৎকার করে বলে— আকাশ পাতাল, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের ইউ খাচ্ছি। আর বাড়ির লোক যারা এতদিন নিরামিশ আতপ চাল খেয়ে কাটিয়েছে তার মূল ঘরে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের ঘরে যেখানে ধিমালদের গৃহ দেবতা থাকে সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে হলুদ ছাড়া মাংস, গোরা জাউরা গেলাই (পূর্বপুরুষ)-এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে নিজেরা খায়। বাইরে সভা থেকে পঞ্চ চিৎকার করে মৃত ব্যক্তির নাম ধরে প্রশ্ন করেন তিনি কি মারা গেছেন? সভায় বসে থাকা লোক বলে ওঠে হ্যাঁ। তারপর আবার সে বলতে থাকে এই তেরদিন মৃতের বাড়ির লোক মাছ-মাংস খায়নি তো— সভার সবাই বলে- খায়নি। পঞ্চ বলেন আজ থেকে তিনি স্বর্গে গেছেন— আর সবাই বলে- হ্যাঁ। পঞ্চক বলেন সেখানে পূর্বপুরুষের সঙ্গে থাকা সবাই জানায় হ্যাঁ। মৃতের বাড়ির সবাইকে হাটে বাজারে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তারপর বাড়ির পশ্চিম ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা পঞ্জিলোকজন দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। সামাজিক ভাবে আবার সমস্ত রকম কাজকর্ম করার অনুমতি পায়। এখান থেকেই ভোজের (অন্তেষ্টিক্রিয়া) সমাপ্তি হয় এবং সবাই হাতে পান সুপারি নিয়ে বিদায় হয়।

বাঙালি সমাজে মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার :

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা বিশ্বাস যেমন আছে তেমনি নানা আচারও গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে। যেমন -

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে একটি মাদুরের উপর উত্তরে মাথা করে শুইয়ে সাদা কাপড় দিয়ে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয় উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা। মৃতের পায়ের তালুতে আলতা মেখে তার ছাপও রাখেন অনেকে। এখানে আসলে সংস্পর্শ মূলক জাদু বিশ্বাসই যুক্ত হয়ে পড়েছে।

মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা সমাধিস্ত এবং আগুনে পুড়োয় দু'ভাবেই সৎকার করে থাকে - মৃতদেহ যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকে ততক্ষণ কেউ না কেউ মৃতের শরীর ছুয়ে থাকে। এরপর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যায় বাঁশের মাচায় করে চারজনে মিলে। সঙ্গে থাকে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা। চিতায় তোলার আগে মৃতের শরীর ঘি মেখে দেওয়া হয়। আর উত্তরদিকে মাথা করে বিবস্ত্র অবস্থায় শোয়ানো হয়। তারপর মৃতের ছেলে থাকলে বড় ছেলে পাঁচবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আগুন দেয় চিতায়। তারপর অন্যান্যয় আগুন দেয় চিতায়। এই আচারটি মুখাগ্নী নামে পরিচিত। মৃত্যু সম্পর্কে ভয় থেকেই এই আচারটির উদ্ভব হয়েছে। আবার মৃতের আত্মা যাতে পরলোকে শান্তিতে থাকতে পারে সেই ধারণা থেকেই এই সমস্ত মৃত্যুকেন্দ্রিক আচারের উদ্ভব হয়েছে। মৃতদেহ সৎকারের পর উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা চিতায় জল ঢেলে দেয়। তারপর মৃতের অস্থি বা হাঁড় কলসীর মধ্যে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে বাড়িতে এবং পরবর্তীতে সেটি গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। এই লোকাচারটি পিন্ডদান নামে পরিচিত। শ্মশান থেকে ফিরে বাড়িতে এসে সরাসরি কেউ ঘরে প্রবেশ করে না। শ্মশান যাত্রীদের কিছু লোকাচার পালন করতে হয়। উঠোনের মধ্যে রাখা হয় আগুন লোহা, তুলসীপাতা, জল, তেতো পাটপাতা। শ্মশান যাত্রীরা ফিরে আগুনে হাত পা সেঁক দিয়ে লোহা স্পর্শ করে পাটপাতা মুখে দেন। এই আচারটি ভীতিদূর করার উদ্দেশ্যেই প্রতিরোধ মূলক প্রয়াস।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা মৃতের দশদিন কিংবা তেরদিনের দিন অন্তেষ্টিক্রিয়া পালন করে থাকে। তবে এর পূর্বের কয়েকদিনও তাদের নানা লোকাচার পালন করতে হয়। যেমন শ্রাদ্ধের আগ পর্যন্ত মৃতের পুত্রদের সাদা থান কাপড় পরিধান করতে হয় এবং গলায় কিংবা শরীরের কোথাও লোহার চাবি কিংবা অন্য কিছু রাখতে হয়। তাছাড়া যে বার মৃত্যু হয়েছিল সেই বার

প্রতিদিন সন্ধায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। খাবারের ক্ষেত্রেও নিরামিষ খেতে হয় হলুদ, তেল ছাড়া।

আবার শ্রাদ্ধের দিন মৃতের সন্তানদের ও মাথা নেড়া করতে হয় নাপিত ডেকে। আবার যারা শ্মশান যাত্রী হয়েছিল তারাও মাথায় নাপিতের ক্ষুর দোয়ায় কিংবা চুল দাড়ি কাটিয়ে নেয়। আবার শ্রাদ্ধের দিন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে তাদের জন্য ভোজর করা হয়। এছাড়া শ্রাদ্ধের মধ্যে ব্রাহ্মণকে গরু দানের প্রথাটিও প্রচলিত থাকে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে।

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী, মোমেন। 'বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিবাহ' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ : ১৯।

২। আহমদ, ড. ওয়াকিল। 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ : ১২১।

৩। Hodgson, Brian Houghton. 'Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects' (Vol-1), Asian Educational Services, New Delhi, 1992, page :139.

৪। Risley, H.H. 'Tribes and Castes of Bengal' (Vol-1)' Firma KLM, Calcutta, 1998, page : 226.

৫। সরকার, দীনেন্দ্র কুমার (সম্পাদিত)। 'বিবাহের লোকাচার' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ : ৬৮।

৬। Risley, H.H. 'Tribes and Castes of Bengal' (Vol-1)' Firma KLM, Calcutta, 1998, page : 228.

উপরিউক্ত তথ্যসূত্র ছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের বিষয় অনুসারে তাদের পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

■ **জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার**

১. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

২. তিনিয়া মল্লিক, বয়স- ৩৮, গ্রাম- সদামল্লিক জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১০.০২.২০১৫।

৩. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৪. সকিতা মল্লিক, বয়স- ৫৮, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৫. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৬. সটমেন মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৭. বিষ্টু মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৭.০৬.২০১৩।

৮. দুর্জন মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৯. টীকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ১৩.০১.২০১৪।

■ **বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার**

১. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

২. তিনিয়া মল্লিক, বয়স- ৩৮, গ্রাম- সদামল্লিক জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১০.০২.২০১৫।

৩. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৪. সকিতা মল্লিক, বয়স- ৫৮, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৫. মৃণালী মল্লিক, বয়স- ২৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

৬. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৭. দীপক মল্লিক, বয়স- ১৯, গ্রাম-মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- স্নাতক প্রথমবর্ষে পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৪।

৮. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৯. সাতানু মল্লিক, বয়স- ৬৪, গ্রাম- ঝাপু জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১০.২০১৪।

১০. সটমেন মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

■ **মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. দুর্জন মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৩. মালবর মল্লিক, বয়স- ৫৫, গ্রাম- সুরজবর জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- সপ্তম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১২.২০১৩।

৪. কেবল মল্লিক, বয়স- ৪২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১২.২০১৩।

৫. মাসোর মল্লিক, বয়স - ৭০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৭.০৬.২০১৩।

৬. সটমেন মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৭.কিষ্ট মল্লিক, বয়স- ৬৫, গ্রাম- শিউবর জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৩.০৭.২০১২।

৮. রতন মল্লিক, বয়স- ৪৭, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৯. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

১০. সাতানু মল্লিক, বয়স- ৬৪, গ্রাম- ঝাপু জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১০.২০১৪।

১১. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

১২. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।